এতকাল বৈঠা বেয়ে

শামসুর রাহমান

এই আমি এতকাল বৈঠা বেয়ে প্রায়
তীরে এসে ডিঙি, হায়, ডুবে
যেতে দেবো? হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি- মাথা
ভর্তি শাদা চুল ওড়ে দুরন্ত বাতাসে।
পাড়ার অনেকে আজো আমার তেজের
তারিফে প্রায়শ মেতে ওঠে, গুণ গায়।

কখনো শ্রমের পরে ক্লান্ত আমি ছেঁড়া বিছানায়
গা ঢেলে দিলেই ঘুম এসে চুমো খায় আর
কিছুক্ষণ কিংবা বেশ কিছুক্ষণ কেটে
গেলে হুর-পরী ডানা মেলে এই
গরীবের হৃদয়কে নাচের মাধ্যমে
বেহেস্তের অপরূপ হুরীময় নর্তকীর নাচে
চঞ্চলিত হয় চতুর্দিক, হয়ে ওঠে তারাময়!
বৈঠাবায়ী মাঝি হয়ে ওঠে বেহেস্তের অধিবাসী!

অকস্মাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে মায়াবী স্বপ্নের
অপরূপ স্পর্শের গৌরব ভুলতে না পেরে ভাবি,-
শুধু ভাবি নর্তকীর অঙ্গভঙ্গী, হাসির ফোয়ারা,
ওদের নাচের ভঙ্গি। শরীরের ঘ্রাণ
তাদের মাতাল করে, যেন এখনো জীবন্ত।
এই আমি বৈঠা বেয়ে বারবার সেই স্বপ্ন দেখি।

জেনে গেছি যে পথে হাঁটতে হবে, সেই পথ
বড় বেশি কন্টকিত, তদুপরি নানা দিকে খুব
ভয়ঙ্কর রক্তলোভী পশুর নিয়ত
বিচরণ পড়ে চোখে। অথচ সে-পথ
এড়িয়ে উদ্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছুতেই হবে ঠিক।
ভয়াবহ সেই পথে মনুষ্য হাড়ের স্তূপ কঙ্কালের!

২/১০/২০০৫

দ্বার খোলো দ্বার খোলো

ফজল-এ-খোদা

আমি কবি বলে দাবি করি
হৃদয়ের কথা কাউকে না কাউকে বলাই শ্রেয়
তার মতো অধম কে যার কেউ নেই
শুনে যেতে পারে কেবল তোমাকে চাই;
আলো পেতে হলে আগুন জ্বালাতে হয়
পোড়াতে পোড়াতে মন কয়লা করতে হয়,
সাপের ছোবল জাপটে ধরতে হয়
দ্বিধায় পড়লে নির্ঘাৎ মরণ!

আমি কবি বলে মনে করি
একা থাকা মানে শূন্যে ভাসা
কক্ষপথ অবারিত বলে লক্ষ্য ফাঁকা,
তার চেয়ে কারো থেকে কৃপা ভিক্ষা করো:
অক্টোপাস হয়ে যাওয়াও তেমন দোষের নয়
প্রথম জোয়ারে জলৌকা নাছোড় হলেও খারাপ নয়
হও যদি ছায়া অদৃশ্য এমন কিছু মন্দ নয়
তবু চাই যাহা চাই যেভাবে যেমন।

আমি কবি তাই বাড়াবাড়ি আছে
বলে যেতেই থাকি দ্বার খোলো দ্বার খোলো।

আমি চাই কচি কোলাহল

রফিক আজাদ

ছিলে তো ভীড়েরই মধ্যে- প্রাণময় শুদ্ধ কোলাহলে,
তবু ‘ভীড়-ভীড়’ ব’লে করছো অযথা বিড়বিড়!
একদা তো ছিলে খুব ছোট্ট ভীড়ে, রোদে-
শালিখের, দোয়েলের, চড়ুইয়ের জ্যোতির্ময় ভীড়ে!

এখন যে ভীড়ে আছো সেখানে ভিড়েছে
গৃধিনী, শকুনী আর শেয়াল-কুকুর,
সংখ্যায় অধিক বেশ বড়ো গণতান্ত্রিক জামাত!
এই ভীড় ভালো লাগে?- ‘অপ’দের তোতলানো ভীড়?

বন্ধুত্বের হার হয়, স্তাবকতা জয়ী হয়ে থাকে!
স্তাবকতা পরিহার ক’রে আমি তো বন্ধুত্ব চাই:
তুমি বন্ধু সুখে থাকো- অন্ধকারে স্তাবকবেষ্টিত,
থাকো তুমি স্বেচ্ছাবন্দী স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে!

আমি চাই রৌদ্রালোক, লাউডগা, কচি কোলাহল॥

ঊণতিরিশটি চাঁদ

রবিউল হুসাইন

প্রতিটি আঁধারের ভেতর আলোর শেকড়
প্রতিটি আলো আর রোদের মধ্যে
শত শত সূর্যের বাস
তেম্নি প্রতিটি জোছনা রাতে
কত কত চাঁদের নিবাস

একটি চাঁদ বারটি মাসে দেয় উপহার
বারটি রাত উজ্জ্বল পূর্ণিমার
কিন্তু শুধু বারটি নয় আমরা চাই
প্রতিরাতেই পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদ
তাই আহা যদি এমন হতো শুধু
একটি নয় নতুন করে অন্ততপক্ষে আরও
আরও ঊণতিরিশটি চাঁদ জন্ম নিত
তাহলে বছরের তিনশ’ ষাট দিনের প্রতিটি রাতের আকাশ
পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় ছেয়ে যেত মোট তিরিশটি চাঁদের আলোয়
নিশি-চরাচরের সমস্ত রাত আর কোনওদিন
দেখা পেত না অন্ধকারের, শেষ হতো না
চির-ভাস্বরিত স্মিত- নরম জোছনার
অমল-ধবল স্বর্গীয় রশ্মির

জানা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে ছিল চাঁদের বাড়ি
সেখান থেকেই ছিট্‌কে পড়ে আকাশে তার হয়েছে ঠাঁই
তিরিশটি চাঁদের যদি আকাশে সত্যিসত্যি জন্ম হয়
তাহলে পৃথিবী চাঁদদের অধীনে গিয়ে
স্থলভূমিহীন বিস্তৃত একটি একক মহামহাসমুদ্রে
পরিণত হতো এবং ব্রহ্মান্ডের মধ্যে হয়তো
একমাত্র অভিনব একটি অভাবিত নতুন
জলগ্রহ হয়ে মহাশূন্যে মনুষ্যহীন ঘুরে ঘুরে ফিরতো

সেই গ্রাম, জ্যোৎস্না ধোয়া-বাড়ি

মহাদেব সাহা

ছিলো যে জ্যোৎস্না ধোয়া-বাড়ির উঠোন, শীতল পাটির
মতো কাঁচা মেঝে
পাতার গোমটা পরা দোচালা টিনের ঘর,
ছিলো যে নারকোল লাড়ুর গন্ধ, সরা-পিঠা, মোয়ার আমোদ
সেই নদীর স্রোতের মতো ভরা গ্রাম, টিয়াপাখি, দাঁড়কাক
দুই চোখ মেলে আজ তার কিছুই দেখিনা, আজ এই
ইপিজেড, ফার্মের দেয়াল, লোহার তারের বেড়া
গুদারা ঘাটের উপর দিয়ে উঁচু ব্রিজ, হালট ভেঙে বাঁধানো
সড়ক
ছলাৎ ছলাৎ দাঁড়টানা নাওগুলি এখন ভটভটি;
সারাগ্রাম সেদিন আত্মীয়, ভাই ও বোনের নামে আরো
কতো বোনভাই
আখখেত, বাঁশবন, শাদাপিঠার মতো গোল চাঁদ,
সেই গাভি ও গোয়াল, ভোরবেলা দুধ দোয়ানোর শব্দ
আজ তার কিছুই দেখি না, উঠে গেছে হাটখোলা, গোলাঘর
পাখ-পাখালি, গাছপালা, দিঘি দও নেই।
কে যে কোথায় গেছে, কেউ কংক্রিটের বনে, কেউ বা সেই
ধু ধু পাথারে
মোষের বাথান বিলভর্তি খল-বল করা মাছ, পুকুর ঘাটের
একটু লাজুক দেখা,
এসব কিছুই নেই, সেই আউশ ধানের ভেজা গন্ধ, সেই
বানের জলের ডাক,
মা-বাবার দুই চোখ ভাসানো বর্ষন
আজ তার সব ফেলে এইখানে শুধু ভাসমান, ভাসমান,
ভাসমান।

ফেরা

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুয়ারে কেন দাওয়ায় উঠে বসো
তোমার সঙ্গে অনেক কথাই বাকি
এখনো কেন জটিল অংক কষো
বলো তো তোমার চশমা কোথায় রাখি!

সেই চলে গেলে কুয়াশা-জাগানো ভোর
আমরা তখন নিত্য তুই-তোকারি,
বকুল ছায়ায় ব্যাকুল বাহুডোর
জ্যামিতিক খাতা বুঝি খুব দরকারি!

সেসব অতীত আনছো কেন তুলে
নতুন জলে নতুন মাছের ঝাঁক
আলোর ঝিলিক রূপালি জোয়ারে খেলে
দূরে যায় সরে ঝাপসা নদীর বাঁক।

দিন মাস ঘুরে দীর্ঘ বিরহকাল
পার হয়ে গেছে আমাদের ঘরদোর,
যদিও আকাশে গোধূলির মেঘ, লাল
কেটে যাবে ঠিকই আসবে নবীন ভোর।

তাকিয়ে দ্যাখো মাদুর বিছানা রাত
জোসনা-মাটিতে অপরূপ মাখামাখি,
কাছে এসে ধরো আমার বাড়ানো হাত
তুমি কথা কও, আমি নয় চুপ থাকি।

নাই আর দেখ সর্বনাশের ছায়া
রাত্রি শেষে শিশির ভেজানো ঘাস,
করতলে থাক আদিম কালের মায়া
দু'জনার চোখে অভিমান, অভিলাষ।

ভালোবাসার শব্দ

কামাল চৌধুরী

দূরত্ব
এই শীতে আমি নিচু হয়ে কথা বলি
আমাদের পাতা ঝরে যায়

তুমি সকালের পাশে বসে এই শুকনো পাতায়
লিখে রাখো প্রণয়ের লিপি

কেবল ছলনা শিখে আমিও পাঠক আজ

আমাদের রোজকার ধূলি
ভাষা থেকে মৃত এক নদী চলেছে বহন করে
কাঁধে কাঁধে...

চিরকূট
কাগজ, টুকরো কথা- সবটাই নীরব প্রস্তাব

এসব কথার ভিড়ে রোদ উঠছে তুমি জেনে নিও
শরীর শুকায় যারা তারা বোঝে স্নানেরও অর্থ
জামাটা উড়িয়ে দিলে নদী তীরে ব্যাকুল বাতাস
স্রোতের সম্মতি চায়-

যথেষ্ট ভেবেছি তাই এর বেশি তোমাকে লিখিনি...

ভবঘুরেদের মতো

তুষার দাশ

ভবঘুরেদের মতো জীবন চেয়েছিলাম।

আমি পর্যটক হতে চাইনি।

পর্যটনে প্রচুর পরিকল্পনা, গোছগাছ, প্রস্তুতির বহর-
আমার এসব একদম ভালো লাগে না।

পাখিরা যখন সীমান্ত পেরোয়, কোনো প্রহরীই
তাদের কিছু করতে পারে না।
তাদের পাসপোর্ট নেই, প্রস্তুতিও নেই।

খুঁটি গেড়ে শক্ত দড়িতে বেঁধে দিয়েছে আমাকে
আমার জীবন। নির্দিষ্ট লোক আর লোকালয়ের
বাইরে যাবার সামান্য জো-টিও নেই এখন।

ছুটি হলে কক্সবাজার অথবা কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি,
না-হয় বাসায় বাসায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা
রাজা-উজির মারার কাহিনী
উত্তরবঙ্গে মঙ্গা
আর শীতে জবুথবু মানুষদের দেখতে চেয়েছিলাম,
তাদের পাশে বসতে চেয়েছিলাম।

এ জন্মে ওই ভবঘুরেদের মতো হতে পারবো কী?